بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ অক্টোবর, ২০২৪ মোতাবেক ১১ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বর্তমানে আহযাব বা পরিখার যুদ্ধের স্মৃতিচারণ চলছে। এটি বর্ণিত হয়েছিল যে, কাফিররা রাতের বেলা ধূলিঝড় ও তুফানের কারণে (যুদ্ধের) প্রান্তর থেকে সটকে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাফিরদের পলায়ন করার পরের ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে সৈন্যদলকে তাড়িয়ে দেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, اَلْآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا অর্থাৎ **'আগামীতে আমরা কুরাইশের বিরুদ্ধে (অভিযানে) বের হবো, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সাহস তাদের হবে না';** আর বাস্তবিক এমনটিই হয়েছে। মুসলমানদের ওপর আক্রমণের স্পর্ধা ও দুঃসাহস কুরাইশের হয় নি, এরইমধ্যে মহানবী (সা.)-এর হাতে মক্কা বিজিত হয়। যাহোক, যখন প্রভাত হয় তখন পরিখার অপর প্রান্তে আর কোনো বিরোধী উপস্থিত ছিল না, সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। সবাই আনন্দের সাথে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে আরম্ভ করেন। বর্ণনা করা হয়, (শত্রু কর্তৃক) প্রায় পনেরো দিন পরিখা অবরুদ্ধ ছিল। আরেক ভাষ্য অনুযায়ী এই অবরোধ বিশ দিন ছিল, আবার এটিও বলা হয় যে, প্রায় এক মাস এই অবরোধ ছিল। পরিখার যুদ্ধে নয়জন শহীদ হয়েছিলেন। (তাদের মধ্যে) একজন ছিলেন সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন আর কয়েকদিন পর মৃত্যু বরণ করেন; আনাস বিন অওস, এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন সাহ্ল, তোফায়েল বিন নু'মান, সা'লাবা বিন আনআমা বিন আদী, কা'ব বিন যায়েদ, কায়েস বিন যায়েদ বিন আমের, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী খালেদ, আবু সিনান বিন সাইফী বিন সাখ্র (রা.)। এছাড়া দুজন সাহাবী প্রথমেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, পূর্বে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে; যারা আবু সুফিয়ানের সেনাদল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গিয়েছিলেন আর সেখানেই শহীদ হয়েছিলেন। এভাবে মোট এগারোজন শহীদ হয়েছেন। এই দুজন (সাহাবী) ছিলেন সুলাইত এবং সুফিয়ান বিন অওফ আসলামী (রা.)।

মুশরিকদের তিনজন মারা যায়। তারা হচ্ছে, আমর বিন আব্দে উদ্, নওফল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুগীরা এবং উসমান বিন মুনাব্বেহ। সে পরিখার (যুদ্ধের) দিন অর্থাৎ, যেদিন কাফিররা প্রবল আক্রমণ করেছিল আর মুসলমানরাও তির দিয়ে তিরের উত্তর দিয়ে দিয়েছিল, তখন একটি তির তার (শরীরে) বিদ্ধ হয় যার আঘাতে পরবর্তীতে সে মক্কায় মারা যায়।

পরিখার যুদ্ধের যে নিদর্শনমূলক পরিণাম হয়েছিল, যেমনটি আমরা ইতিহাসে পর্যবেক্ষণ করেছি, এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

'প্রায় পনেরো-বিশ দিন অবরোধের পর কাফির সেনাবাহিনী অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায় আর বনু কুরায়যা যারা তাদের সাহায্যার্থে বেরিয়েছিল তারাও নিজেদের দুর্গে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাণহানি বেশি হয় নি। অর্থাৎ, মাত্র পাঁচ-ছয়জন শহীদ হয়েছেন, কিন্তু অওস গোত্রের প্রধান নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) এত গুরুতর আহত হন

যে, শেষ পর্যন্ত তিনি আর সেরে উঠতে পারেন নি; আর এই ক্ষতি মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। কাফির সৈন্যদের মধ্যে মাত্র তিনজন নিহত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে কুরাইশরা এমন আঘাত পায় যে, এর পরে তারা আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বের হওয়ার কিংবা মদীনার ওপর আক্রমণোদ্যত হওয়ার সাহস করে নি। আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। কাফির সৈন্যবাহিনী চলে যাবার পর মহানবী (সা.)-ও সাহাবীদেরকে ফিরে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন আর মুসলমানরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায় প্রবেশ করেন। পরিখা বা আহযাবের যুদ্ধ, যা এমন অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়, (অথচ এটি) এক চরম বিপজ্জনক যুদ্ধ ছিল। সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর এর চেয়ে বড় আকস্মিক বিপদ আর আসে নি, কিংবা এর পরেও মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এমন বড়ো বিপদ তাঁর ওপর আসে নি। এটি এক ভয়ানক ভূমিকম্প ছিল যা ইসলামের ভিত্তিকে মূল থেকে কম্পিত করে দিয়েছিল এবং এর ভীতিকর দৃশ্য অবলোকন করে মুসলমানদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল আর তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হয়েছিল এবং দুর্বল লোকেরা ভেবে বসেছিল, এখন ধ্বংস অনিবার্য! আর এই ভয়ানক ভূমিকম্পের আঘাত প্রায় এক মাস তাদের ওপর আসতে থাকে। আর কয়েক হাজার রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণী তাদের বাড়িঘর অবরুদ্ধ করে তাদের জীবনকে তিক্ত করে তোলে এবং বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা এই কষ্টের তিক্ততাকে দ্বিগুণ করে তোলে। আর এই পুরো নৈরাজ্যের মূলে ছিল বনু নযীর গোত্রের সেসব অকৃতজ্ঞ ইহুদী, মহানবী (সা.) যাদের প্রতি অনুগ্রহবশত তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনা বের হয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। সেসব ইহুদী নেতার উস্কানির ফলেই আরব মরুভূমির সকল প্রসিদ্ধ গোত্র ইসলামের শত্রুতার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার জন্য মদীনায় একত্রিত হয়েছিল এবং এটি সুনিশ্চিত যে, যদি সে–সময় এই হিংস্র প্রাণীরা শহরে প্রবেশের সুযোগ পেতো তাহলে একজন মুসলমানও প্রাণে বাঁচতো না এবং কোনো পবিত্র মুসলমান নারীর সম্মান তাদের নোংরা আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকতো না। কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ ও তাঁর ক্ষমতার অদৃশ্য শক্তির ফলেই এই পঙ্গপালদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে এবং মুসলমানরা কৃতজ্ঞচিত্তে শান্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে আসে। বনু কুরায়যার হুমকি তখনও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান ছিল। তারা চরম ভয়ানকরূপে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করে তখনো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজেদের দুর্গে অবস্থান করছিল আর মনে করছিল, এখন আর কেউ আমাদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তাদের নৈরাজ্যকে নির্মূল করা আবশ্যক ছিল, কেননা তাদের অস্তিত্ব মদীনার মুসলমানদের জন্য আস্তিনের সাপ তথা গোপন শত্রুর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। আর অপরদিকে বনু নযীর গোত্র কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা এটিই বলে যে, এই সাপ এরূপ যাকে বাড়ি থেকে বাইরে বের করাও একে বাড়িতে অবস্থান করতে দেবার মতোই ভয়ংকর।

যাহোক, একে নির্মূল করার জন্য বনু কুরায়যার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যাকে বনু কুরায়যার যুদ্ধ বলা হয়, যা ৫ম হিজরীর যিলকদ মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَـٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا - وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا

অর্থাৎ, এবং আহ্‌লে কিতাব হতে যারা তাদের সাহায্য করেছিল, তিনি তাদেরকে তাদের দুর্গসমূহ হতে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, (এমন কি) তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দি করছিলে। এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূ-সম্পত্তির, তাদের ঘর-বাড়ির এবং তাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন এবং সেই ভূমিরও যার ওপর তোমরা (এখনও) পদার্পণ করো নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান। **(সূরা আল আহযাব : ২৭-২৮)**

বনু কুরায়যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে, বনু কুরায়যা ইহুদীদের একটি গোত্র। এরা কুরায়যার বংশধর ছিল যারা মদীনার সন্নিকটে কয়েক মাইল দূরত্বে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বসতি স্থাপন করেছিল। এরপর তার নামেই (এই গোত্র) পরিচিতি লাভ করে। কুরায়যা এবং নযীর ছিল দুই ভাই, হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধরদের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল। একজনের বংশধর বনু কুরায়যা এবং অপরজনের বংশধর বনু নযীর আখ্যায়িত হয়। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, যেমনটি বিগত খুতবাগুলোতেও বর্ণিত হয়েছে এবং খন্দকের যুদ্ধের বিশদ বিবরণেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু কুরায়যা ঠিক যুদ্ধকালীন সময়ে চুক্তিভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সহায়তা করেছিল এবং সেসব চুক্তি ভঙ্গ করেছিল যা তাদের ও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর মাঝে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন খন্দকের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) ও সাহাবীগণ অস্ত্র নামিয়ে রাখেন। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন ও পানি চান আর (তা দিয়ে) নিজ মাথা ধৌত করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) গোসল করেন ও সুগন্ধি আনান এবং যোহরের নামায আদায় করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা ঘরেই অবস্থান করছিলাম, এমন সময় একজন ব্যক্তি আমাদের সালাম দেন। তার আহ্বান শুনতেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্রুত তার নিকট যান আর আমি দরজার ফাঁকা স্থান দিয়ে দেখছিলাম। আমি দেখি, সেখানে হযরত দাহ্‌ইয়া কালবী ছিলেন। তিনি তার চেহারা থেকে ধুলাবালি পরিষ্কার করছিলেন আর তিনি পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বাহনের ঘাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখি নি। অপর একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে, যখন থেকে আপনি শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন তখন থেকে ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে নি আর আমরা এখনই আহযাবের পশ্চাদ্ধাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি। অর্থাৎ তিনি এ কথা বলেছেন যে, ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে নি, এমনকি আমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাই আর আল্লাহ্ তাদের পরাজিত করেছেন। এখন আপনি এদিক পানে চলুন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোন দিকে? তিনি তখন ইঙ্গিতে বলেন, এদিকে অর্থাৎ বনু কুরায়যার দিকে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ভেতরে চলে আসি। যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ভেতরে আসেন তখন আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি কে ছিল যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে দেখেছিলে? আমি উত্তরে বললাম, জ্বী। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তাকে কোন ব্যক্তির অনুরূপ দেখতে পেয়েছিলে? উত্তরে আমি বলি, হযরত দাহ্‌ইয়া কালবীর মতো। তিনি (সা.) বলেন, ইনি জিবরাঈল ছিলেন। এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে

নি। ইনি জিবরাঈল ছিলেন, যিনি আমাকে বলছিলেন আমি যেন বনু কুরায়যার দিকে যাই। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সে সময়ই ঘোষণা করান যে, বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও এবং আসরের নামায সেখানেই আদায় কোরো। অতএব ঘোষণা শোনামাত্রই সাহাবীরা দ্রুততার সাথে রওয়ানা হয়ে যান। সাহাবীদের আনুগত্য ও নির্দেশ মান্য করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, পথিমধ্যে যখন আসরের নামাযের সময় হয় এবং নামাযের সময় প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন কতিপয় সাহাবী এ কথা চিন্তা করে যে, নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই নামায আদায় করে নেওয়া উচিত, (তারা) নামায আদায় করে নেন এবং বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী অনুযায়ী কতিপয় সাহাবী বলেন, যেহেতু মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আসরের নামায বনু কুরায়যাতে গিয়ে আদায় করতে হবে এজন্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাক, আমরা সেখানে গিয়েই (নামায) আদায় করব। বর্ণনা অনুযায়ী তারা এমন সময় পৌঁছেন যখন সূর্য অস্ত হয়ে গিয়েছিল আর তখন তারা সেখানে পৌঁছে আসরের নামায আদায় করেন। আর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) উভয় দলকেই কিছুই বলেন নি; যারা নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার আশঙ্কায় পথিমধ্যে নামায আদায় করেছিলেন তাদেরকেও কিছু বলেন নি আর যারা সূর্য অস্ত যাবার পর বনু কুরায়যাতে গিয়ে (নামায) আদায় করেছিলেন তাদেরকেও বলেন নি। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডাকেন এবং তাকে সৈন্যদের কালো রঙের **'উকাব'** নামক পতাকা প্রদান করেন।

এই বর্ণনা সহীহ্‌ বুখারী এবং কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। এর আরও বিস্তারিত বর্ণনা হলো, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.)-কে একটি দলের সাথে অগ্রগামী দলরূপে সম্মুখে প্রেরণ করেন। আর এরপর তিনি (সা.) নিজেও তাদের পিছুপিছু রওয়ানা হয়ে যান।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন যে,

মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে আসার পর অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি খুলে সবেমাত্র গোসল শেষ করেছেন তখনই আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে এটি জানানো হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের মীমাংসা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অস্ত্র নামিয়ে রাখা উচিত নয়। অতঃপর মহানবী (সা.)-কে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন অনতিবিলম্বে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এতে তিনি (সা.) সাহাবীদের মাঝে এই সাধারণ ঘোষণা করিয়ে দেন যে, সবাই যেন বনু কুরায়যার দুর্গের দিকে রওয়ানা হয়ে যায় আর আসরের নামায সেখানে গিয়ে আদায় করা হয় এবং তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাহাবীদের একটি দলসহ তৎক্ষণাৎ অগ্রে প্রেরণ করেন।

পূর্বে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতেও এটি বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, এটি দিব্যদর্শন ছিল যেমনটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও লিখেছেন আর হতে পারে যে, এই দৃশ্য হযরত আয়েশা (রা.)-ও দিব্যদর্শনে দেখেছেন, আর এমনটি হয়েও থাকে। বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে বুধবার যাত্রা করেন। আর তখন যিলকদ মাসের সাত দিন অবশিষ্ট ছিল। মহানবী (সা.) অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম পরিধান করেন এবং শিরস্ত্রাণ পরেন আর নিজ হাতে বর্শা তুলে নেন ও ঢাল গলায় ঝুলিয়ে নেন আর নিজ ঘোড়া লুহায়েফ-এ আরোহণ করেন। মুসলমানদের কাছে তখন ৩৬টি ঘোড়া ছিল আর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন। ইবনে

সা'দ বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তিন হাজার সদস্য ছিল। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) মুহাজির ও আনসারের একটি দলের সাথে পূর্বেই বনু কুরায়যার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হযরত আবু কাতাদা বলেন, আমরা বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছে যাই আর হযরত আলী (রা.) দুর্গের নীচে পতাকা স্থাপন করেন। তারা যখন আমাদেরকে দেখতে পায় তখন তারা যুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিত হয়। অতঃপর তারা নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদেরকে গালি দিতে থাকে। হযরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেন যে, আমরা নীরব থাকি এবং এসব গালির কোনো উত্তর দেই নি আর বলি যে, এখন তোমাদের আর আমাদের মাঝে তরবারিই সিদ্ধান্ত দেবে। মহানবী (সা.)-ও বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছে যান আর বনু কুরায়যার পাহাড়ের পাদদেশে বি'রে উন্নাহ্-তে তাদের দুর্গের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করেন। এটিকে বি'রে আন্নাহ্ও বলা হয় আর এটি বনু কুরায়যার কূপগুলোর মধ্য থেকে একটি কূপ। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যে বিস্তারিত বর্ণনা লিখেছেন তা এরূপ যে,

হযরত আলী (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন বনু কুরায়যা গোত্র, যাদের মাঝে খন্দকের যুদ্ধের পর বনু নাযীরের প্রধান নেতা ও নৈরাজ্যের হোতা হুয়ী বিন আখতাবও নিজ ওয়াদা অনুযায়ী এসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের কারণে অনুশোচনা প্রকাশ করে ক্ষমা ও কৃপা যাচনার পরিবর্তে তারা প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)-কে গালি দেয় আর অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও নীচতার সাথে তাঁর (সা.) পবিত্র সহধর্মিণীদের সম্পর্কেও চরম ঘৃণ্য অপলাপ করে। হযরত আলী ও তার দল যাত্রা করার কিছুক্ষণ পরেই মহানবী (সা.)-ও সশস্ত্র হয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তখন তিনি (সা.) একটি ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন আর সাহাবীদের একটি বৃহৎ দল তাঁর সাথে ছিল। তিনি (সা.) যখন বনু কুরায়যার দুর্গের নিকটে পৌঁছেন তখন হযরত আলী (রা.), যিনি তাঁকে (সা.) স্বাগত জানানোর জন্য কিছুটা পথ ফিরে এসেছিলেন, তাঁর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মতে আপনার স্বয়ং সামনে এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। আমরাই ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট। তিনি (সা.) বুঝতে পারেন আর বলেন, বনু কুরায়যা কি আমার সম্পর্কে কোনো অপলাপ করেছে? অর্থাৎ তিনি যখন দেখেন যে, হযরত আলী (রা.) তাঁকে বারণ করছেন এর অর্থ হলো তারা অবশ্যই কোনো অপলাপ করে থাকবে। হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন যে, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। মহানবী (সা.) বলেন, কোনো সমস্যা নেই, قد أُوذِيَ موسى بأكثر من هذا অর্থাৎ মূসা (আ.) এ লোকদের পক্ষ থেকে এরও অধিক দুঃখ পেয়েছিলেন। এরপর তিনি (সা.) আরো সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বনু কুরায়যার এক কূপের পাশে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। এক রেওয়াত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, তাদের এতটা সাহস নেই যে, আমার সামনে আমাকে গালমন্দ করবে, এরপর তিনি (সা.) অতি প্রশান্ত চিত্তে এবং সগৌরবে সম্মুখে অগ্রসর হন।

মুসলমানদের এই যুদ্ধে খাবারেরও একটি উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ সকল সাহাবী এশার পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে একত্রিত হয়ে যান আর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খেজুর বোঝাই একটি উট মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করেন। সেদিন মহানবী (সা.) বলেন, খেজুর কতই না উত্তম খাবার!

মুসলমান কর্তৃক বনু কুরায়যার (দুর্গ) অবরোধের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) সেহরির সময় সামনে অগ্রসর হন আর তিরন্দাজ দলকে

সম্মুখভাগে রাখেন। তারা ইহুদীদের দুর্গ ঘিরে ফেলেন আর তাদের ওপর তির বর্ষণ করেন এবং পাথর নিক্ষেপ করেন। আর তারাও অর্থাৎ ইহুদীরাও তাদের দুর্গ থেকে তির বর্ষণ করতে থাকে, এমতাবস্থায় সন্ধ্যা নেমে আসে। এরপর (মুসলমানরা) দুর্গের আশপাশে রাত্রিযাপন করেন এবং ইহুদীদের ওপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করতে থাকেন। মহানবী (সা.) একাধারে তাদের ওপর তির বর্ষণ করাতে থাকেন। এক পর্যায়ে ইহুদীরা নিজেদের পরাজয় অনিবার্য বলে স্বীকার করে নেয় আর মুসলমানদের ওপর তির বর্ষণ পরিত্যাগ করে এবং বলতে থাকে, আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা তোমাদের সাথে সংলাপে বসতে প্রস্তুত আছি। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে। তারা নাব্বাশ বিন কায়সকে তাঁর (সা.) কাছে প্রেরণ করে। সে মহানবী (সা.)-কে বলে, তাদেরকে এখান থেকে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক, যেভাবে বনু নাযীর এখান থেকে চলে গিয়েছিল আর আপনি আমাদের ধনসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিন আর আমাদের প্রাণভিক্ষা দিন। আমরা আপনাদের শহর থেকে আমাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে চলে যাব। [ইহুদীদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।] আর আমরা কেবল ততটা মালপত্র নেব যতটা একটা উট বহন করতে সক্ষম। কিন্তু মহানবী (সা.) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন নাব্বাস বলে, আমাদের উট বহন করতে পারে এমন সম্পদেরও আমাদের প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাঁর (সা.) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নিজ জাতির কাছে ফেরত চলে যায়। এরপর বনু কুরায়াযার নেতারা পরস্পর শলাপরামর্শ করে। নাব্বাশ যখন নিজ জাতির কাছে ফেরত গিয়ে তাদেরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং অবরোধ যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন বনু কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদ নিজ জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের ওপর এক পরীক্ষা এসেছে যা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ। আমি তোমাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব রাখছি। এগুলোর মধ্য থেকে যেটি চাও সেটি গ্রহণ করতে পারো। তারা বলে, সেগুলো কী? কা'ব বিন আসাদ বলে, (চলো) আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য গ্রহণ করি এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নেই; কেননা আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা নিশ্চয় বুঝে গেছ যে, তাঁকে নবী হিসেবে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর (আগমনের) উল্লেখ তোমরা তোমাদের (ঐশী) কিতাবে পাঠ করে থাকো আর আমাদের ঈমান আনার কারণে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মহিলারা নিরাপদ হয়ে যাবে। খোদার কসম! তোমরা নিশ্চয় জানো, মুহাম্মদ (সা.) (আল্লাহ্‌র) নবী আর তাঁর (ধর্মে) দীক্ষা নেবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কেবল এ বিষয়টি বাধ সাধছে যে, তিনি আরব এবং তিনি বনী ইসরাঈলী নন। অতএব তিনি যে জাতিরই হন না কেন, আল্লাহ্‌ই তাঁকে নবী বানিয়েছেন। [তিনি এখন যা-ই আছেন, তাঁকেই তো আল্লাহ্‌ নবী বানিয়েছেন– এ বিষয়টি তো সুস্পষ্ট।] আরও বলে, আমি তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সমর্থন করতাম না, কিন্তু এ বিপদ এবং পরীক্ষা এই হুয়ী বিন আখতাবের কারণেই ঘটেছে। সে পাশেই বসা ছিল। তখন কা'ব বলে, তোমাদের স্মরণ আছে, ইহুদীদের একজন পুরোনো আলেম ছিল। তিনি যখন তোমাদের নিকট আসেন তখন তিনি তোমাদের কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি মদ, সিরকা এবং খেজুরের ভূমি অর্থাৎ বায়তুল মাকদাস পরিত্যাগ করেছি আর পানি, খেজুর এবং ভুট্টার দেশে চলে এসেছি। লোকেরা তখন বলে, এমনটা কেন করেছেন? কা'ব বিন আসাদ বলে, এই গ্রাম হতে এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে আর সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তার আনুগত্য করব এবং তাকে সাহায্য করব। আর সে যদি আমার মৃত্যুর পর আগমন করে তাহলে তোমরা

সাবধান থাকবে, কেউ যেন তাঁর বিষয়ে তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। অর্থাৎ, তোমরা তাঁকে মেনে নিও, অস্বীকার কোরো না। তাঁর আনুগত্য করবে, তাঁর সাহায্যকারী এবং বন্ধু হবে। আমি তো উভয় কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। প্রথমটির প্রতিও এবং শেষটির প্রতিও। [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতিও।] আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছে দেবে এবং তাকে বলবে, আমি তাঁর সত্যায়ন করেছিলাম। তখন কা'ব বলে, অতএব চলো আমরা তাঁর অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ এবং সত্যায়ন করি। একথা শুনে বনু কুরায়যার লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, তওরাতে যে সিদ্ধান্ত রয়েছে তা থেকে আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হবো না; [অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব।] আর এর পরিবর্তে অন্য কোনো কিতাব আমরা গ্রহণ করব না। তখন কা'ব তাদের বলে, যদি তোমরা আমার এই কথা না মানো তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, চলো আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করি। অতঃপর তরবারি ধারণ করে মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। (এর ফলে) আমাদের পেছনে কোনো বোঝা থাকবে না, (এ যুদ্ধ চলবে) যতক্ষণ না খোদা তা'লা আমাদের এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন। যদি আমরা মারা যাই তাহলে শুধুমাত্র আমরাই ধ্বংস হবো। আমাদের পেছনে পুরো জাতি থাকবে না যাদের জন্য আমাদের কোনো শঙ্কা থাকবে। আর যদি আমরা বিজয় লাভ করি তাহলে আমার বয়সের (অভিজ্ঞতার) কসম! স্ত্রী-সন্তান আমরা পরবর্তীতেও লাভ করতে পারব। লোকেরা বলল, আমরা কি এই সকল মিসকিনদের হত্যা করব! তাদের মৃত্যুর পর জীবনের আনন্দ কী-ইবা বাকি থাকবে? কা'ব তখন বলে, তোমরা যদি আমার এই কথাও না মানো তাহলে আজ তো শনিবার রাত অর্থাৎ সাবাতের রাত। আর আশা করা যায় আজকের রাত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীরা আমাদের বিষয়ে শঙ্কাহীন থাকবেন, তাই তোমরা তাঁর ওপর আক্রমণ করো। হয়ত এর ফলে আমরা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতারিত করতে পারব। তারা বলল, আমরা কি আমাদের সাবাতকে নষ্ট করব আর এদিন কি আমরা এমন কাজ করব যা ইতঃপূর্বে আমাদের কেউ করে নি? শুধুমাত্র তারা ব্যতিরেকে যাদেরকে তুমি জানো আর তাদের বিপথগামী হবার কথা তোমার অজানা নয়। আর এভাবে তারা কা'বের তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটিও মানতে অস্বীকৃতি জানায়। কা'বের পরে আরেকজন ইহুদী আমর বিন সওদা বলে, হে ইহুদীদের দল! তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তি করেছ এবং তোমরা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ যা তোমাদের এবং তাদের মাঝে ছিল। আর আমি তোমাদের এই চুক্তিরও অংশ ছিলাম না আর এখন আমি তোমাদের এই প্রতারণার সাথেও যুক্ত নই। যদি তোমরা তাঁর ধর্মে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে কমপক্ষে ইহুদী ধর্মে তো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো! [যদি তাদেরকে অস্বীকার করো তাহলে ইহুদী ধর্মের যে শিক্ষা রয়েছে– এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো] আর তাদেরকে জিযিয়া (তথা যুদ্ধকর) দিয়ে দাও। খোদার কসম! আমি জানি না, তারা এটি গ্রহণ করবে কিনা। তারা বলতে লাগল, আরবদের নিকট হতে নিজেদের গর্দান মুক্তির জন্য আমরা কোনো যুদ্ধকর দেবো না। [এটি অসম্ভব, আমরা এটি দেবো না;] এর চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যু শ্রেয়। অতঃপর আমর বলে, তাহলে আমি তোমাদের থেকে দায়মুক্ত! আর সেই রাতেই সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায়। সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রহরীদের সামনে দিয়ে চলে যায়। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে সে বলে, আমর বিন সওদা। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলেন, চলে যাও। আরও বলেন, اللهم لاتحرمنى اقالته اثرات الكرام

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমাকে পুণ্যবানদের দোষত্রুটি গোপন রাখার নেক আমল হতে বঞ্চিত রেখো না। আর তার পথ ছেড়ে দেয়। অতঃপর সে বের হয়ে মহানবী (সা.)-এর মসজিদে চলে আসে। আর সেখানেই ভোর হয় এবং ভোরবেলা সে সেখান থেকে চলে যায়। জানা যায় নি যে, সে কোথায় গিয়েছে? একথা যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তার বিশ্বস্ততার কারণে পরিত্রাণ দিয়েছেন। একইভাবে কা'বের একথা শুনে আরো তিন ব্যক্তি দুর্গ থেকে নেমে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে আর নিজেদের প্রাণ, পরিবার ও ধনসম্পদ সুরক্ষিত করে।

হযরত আবু লুবাবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখা আছে, এবার মহানবী (সা.) দুর্গের ওপর কঠোরতা বৃদ্ধি করেন। তাদের ওপর অবরোধ যখন চেপে বসে তখন তারা সাবাতের রাতে মহানবী (সা.)-এর নিকট বার্তা প্রেরণ করে যে, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযিরকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন যেন আমরা তার সাথে নিজেদের বিষয়ে পরামর্শ করতে পারি। ইনি বনু কুরায়যার মিত্র অওস গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে প্রেরণ করেন। তারা যখন হযরত আবু লুবাবাকে দেখে তখন পুরুষরা তার দিকে ছুটে আসে এবং মহিলা ও শিশুরা তার সামনে কাঁদতে থাকে। হযরত আবু লুবাবা তাদের দেখে গলে পড়লেন অর্থাৎ তাদের জন্য তার হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হলো। কা'ব বিন আসাদ এই চাল চেলেছিল। কা'ব বিন আসাদ বলল, হে আবু লুবাবা! আমরা কেবল আপনাকে নির্বাচন করেছি। মুহাম্মদ (সা.) নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত নয়। আপনার মতামত কী? আমরা কি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেব? উত্তরে হযরত আবু লুবাবা বলেন, হ্যাঁ, আর নিজের হাত দিয়ে গলার দিকে জবাই করার ইশারা প্রদান করেন। [এভাবে গলায় ইশারা করলেন।] হযরত আবু লুবাবা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, ইত্যবসরে আমি অনুভব করলাম যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছি। আমি এই ভেবে লজ্জিত হলাম যে, আমি এ-কি ইশারা দিলাম! আর আমি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাইহি রাজিউন পড়লাম। আমি নীচে নামলাম আর আমার দাড়ি অশ্রুতে সিক্ত ছিল। মানুষ আমার অপেক্ষায় ছিল আর আমি দুর্গের পেছন দিক থেকে আরেক পথ ধরলাম এবং মসজিদে চলে আসলাম। মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলাম না। আমি নিজেকে খুঁটির সাথে বাঁধলাম, শাস্তি হিসাবে নিজেকে বেঁধে দিলাম। আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'লা আমার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না, এমনকি মরে গেলেও না। অতঃপর আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট অঙ্গীকার করলাম, আমি বনু কুরায়যার মাটিতে কখনো পা রাখব না আর সেই জনপদের দিকেও তাকাবো না যেখানে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। মহানবী (সা.) যখন আমার চলে যাবার এবং আমার এ আচরণের সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা তার বিষয়ে যা চান সে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। সে যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। সে যেহেতু আমার কাছে আসে নি এবং চলে গিয়েছে, তাই তার বিষয়টা ছেড়ে দাও। হযরত আবু লুবাবা বর্ণনা করেন, আমি ভীষণ কষ্টে ছিলাম। কয়েক রাত আমি কোনো খাবার খাই নি এবং কোনো পানীয়ও নয়। আর আমি একথা বলতে থাকলাম, আমি এভাবেই থাকব, যতক্ষণ না আমি মারা যাই কিংবা আল্লাহ্ আমার তওবা কবুল করেন। আর আমি আমার সেই স্বপ্নের কথা স্মরণ করতাম যা আমি দেখেছিলাম। আমরা যখন বনু কুরায়যা অবরোধ করে রেখেছিলাম, এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি কোনো দুর্গন্ধযুক্ত কালো মাটিতে পড়ে আছি এবং আমি সেখান

থেকে বের হতে পারছিলাম না। আমি এর দুর্গন্ধের কারণে মরে যাবার উপক্রম হলো। অতঃপর আমি একটি নহর প্রবাহিত দেখলাম এবং দেখলাম যে, আমি তাতে গোসল করেছি, এমনকি আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আর আমি সুগন্ধ পাচ্ছিলাম। আমি হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি বিষয়ের সাথে জড়িয়ে যাবে যে কারণে তুমি দুঃখভারাক্রান্ত হবে। তারপর তোমাকে সেখান থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে। অতএব আমি বাঁধা অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-র কথা স্মরণ করতাম এবং আশা রাখতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য ক্ষমা অবতীর্ণ করবেন। তিনি বলেন, আমি ওভাবেই রইলাম, এমনকি দুর্বলতার কারণে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। খুঁটির সাথে বাঁধা ছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে দেখতেন। ইবনে হিশাম বলেন, তিনি ছয় রাত পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু লুবাবার তওবা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ: আর কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা পুণ্যকর্মকে অন্যান্য মন্দকর্মের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে। অচিরেই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী। (আত-তাওবা: ১০২)

হযরত আবু লুবাবার তওবা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কাছে সেহরীর সময় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি (সা.) হযরত উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। হযরত উম্মে সালামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সেহরীর সময় মুচকি হাসতে দেখি। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে সর্বদা প্রফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। আপনি কী বিষয়ে হাসছেন? তিনি (সা.) বলেন, আবু লুবাবার জন্য সুসংবাদ আছে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি কি তাকে সুসংবাদ জানাতে পারি? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? তুমি চাইলে সুসংবাদ জানিয়ে দিতে পারো। অতঃপর তিনি নিজের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবু লুবাবা! আনন্দিত হও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমার তওবা কবুল করেছেন। লোকেরা তার বাঁধন খুলতে তার কাছে গেলে হযরত লুবাবা বললেন, না, মহানবী (সা.)-ই আমার (বাঁধন) খুলবেন। তিনি বলতে থাকেন, না, আমি তো বাঁধা অবস্থায় রয়েছি। এখন খুললে কেবল মহানবী (সা.)-এরই খোলার অধিকার রয়েছে। অতঃপর মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামাযের জন্য আসেন তখন তিনি (সা.) নিজের পবিত্র হাতে তাকে (অর্থাৎ তার বাঁধন) খুলে দেন। হযরত আবু লুবাবা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার তওবা হলো, আমি আমার জাতির সেই ঘরবাড়ি পর্যন্ত পরিত্যাগ করব যেখানে আমার মাধ্যমে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর পথে দান করে দেবো। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু লুবাবা! তোমার জন্য এক–তৃতীয়াংশই যথেষ্ট।

এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আবু লুবাবা সম্পর্কে উল্লিখিত যে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তা সিহাহ সিত্তায় পাওয়া যায় না, সম্ভবত হযরত আবু লুবাবা তাদেরকে হত্যার যে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন তা কেবল তার চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছিল; কিন্তু যাহোক ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে লিখেছেন,

পরিশেষে বনু কুরায়যা কঠোর অবরোধের কারণে তিক্ত হয়ে গেলে তারা এ প্রস্তাবনা দিল যে, এমন একজন মুসলমানকে দুর্গে আমন্ত্রণ জানানো হোক যে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে এবং যে নিজ সরলতার কারণে তাদের বশে আসতে পারে আর তার মাধ্যমে যেন এটি জানা যায় যে, তাদের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর অভিসন্ধি কী, এবং সে অনুযায়ী তারা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করতে পারে। সুতরাং তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এক দূত প্রেরণের মাধ্যমে এ নিবেদন জানায় যে, আবু লুবাবা বিন মুনযির নামক আনসারীকে যেন তাদের দুর্গে প্রেরণ করা হয়, যার সাথে তারা পরামর্শ করতে পারবে। তিনি (সা.) আবু লুবাবাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি তাদের দুর্গে প্রবেশ করেন। বনু কুরায়যার সর্দাররা এ পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, আবু লুবাবা দুর্গের ভেতর প্রবেশ করার সাথে সাথে সকল ইহুদী মহিলা ও শিশু ক্রন্দন-আহাজারি করতে করতে তার কাছে একত্রিত হবে এবং নিজেদের দুঃখকষ্ট ও বিপদাবলির কথা বর্ণনার মাধ্যমে তার হৃদয়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। আবু লুবাবার ওপর এই কৌশল কার্যকর হয়ে গেল এবং তিনি দুর্গে যেতেই তাদের ষড়যন্ত্রের জালে ফেঁসে গেলেন। বনু কুরায়যার এই প্রশ্নের উত্তরে যে, হে আবু লুবাবা! আপনি আমাদের অবস্থা দেখছেন। আমরা কি মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে নিজেদের দুর্গ থেকে নীচে নেমে আসব? আবু লুবাবা নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ; কিন্তু একই সাথে নিজের গলায় হাত চালিয়ে ইঙ্গিত করলেন, মহানবী (সা.) তোমাদের হত্যার নির্দেশ দেবেন। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল। মহানবী (সা.) কখনোই এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাদের বিপদগ্রস্ত হবার অভিনয়ে প্রভাবিত হয়ে আবু লুবাবার মতামত বিপদের স্রোতে এমন ভেসে গেল যে, মৃত্যুর পূর্বে থামল না। আর আবু লুবাবার ভুল সহানুভূতির কারণে পরে তিনি নিজেও অনুতপ্ত ছিলেন এবং এই অনুতাপে নিজেই নিজেকে মসজিদে গিয়ে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলেন। এমনকি মহানবী (সা.) স্বয়ং গিয়ে ক্ষমা করে তার বাঁধন খুলে দেন। যাহোক এটি বনু কুরায়যার ধ্বংসের কারণ হয়ে গেল; অর্থাৎ তাদের এই হঠকারিতা যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে নীচে নামবো না। যাহোক ভবিষ্যতে এই বিবরণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

পাকিস্তানের আহমদীদের নিজেদের জন্য দোয়া করা উচিত। বর্তমানে তাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের উচিত পূর্বের চেয়ে বেশি চেষ্টা করা। কেননা যেভাবে আমি বলেছি, পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ ও কৃপা করুন। একইভাবে পৃথিবীতে বসবাসকারী অন্যান্য পাকিস্তানি আহমদীদেরও বিশেষভাবে নিজেদের পাকিস্তানি ভাইদের জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দান করুন। একইভাবে বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। তারা নিজেরাও যেন নিজেদের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। সেখানেও আহমদীরা বিপদে নিপতিত। আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকেও জরিমানা, গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদ রাখুন। সুদানের আহমদীরাও বিপদে আছেন। সেখানকার যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে তাদের জন্যও দোয়া করুন।

প্রতিটি স্থানে কলেমা পাঠকারীদের কারণেই আরেকদল কলেমা পাঠকারী বিপদে নিপতিত। এই কারণেই অমুসলমানরা নির্দ্বিধায় মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লাই ইসরাঈলী সরকার ও আমেরিকার সরকারকে

এবং পরাশক্তিগুলোকে বিরত করতে পারেন; তাঁর হাতে সকল শক্তি। কিন্তু এর জন্য মুসলমানদেরকেও নিজেদের কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে, ভাই ভাই হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বসমূহকে দূর করতে হবে, যা কোথাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সেরূপ করলে পরেই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে, এছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। এক খাঁটি মুমিন হয়ে থাকতে হবে মুসলমানদের। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এবং সকল মুসলমানকে এর সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)